আজকের কাগজ

45

তারিখ 06 SEP 1992
পৃষ্ঠা 8 কলাম 3

# পরীক্ষায় আশাতীত সাফল্যের বিড়ম্বনা!

বিনোদ দাশগুপ্ত

**আবার এক নয়া ব্যবস্থা চালু করার কথা বলে তারা বর্তমানে প্রবর্তিত ব্যবস্থার ভ্রান্তি স্বীকার করেই নিয়েছেন। মাত্র একবার চালিয়েই যে ব্যবস্থা পরিবর্তনের তৎপরতা শুরু করতে হয় তা কতখানি অচিন্তিতপূর্ব সেটা ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখে না। মানুষ অবশ্যই আশা করবে যে, শিক্ষা বোর্ডগুলো ছাত্র–ছাত্রীদেরকে (নিশ্চয় অভিভাবকদেরও) নিয়ে এমন ভ্রমাত্মক পরীক্ষা–নিরীক্ষা আর চালাবেন না।**

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'খ্যাতির বিড়ম্বনার (নাটক) অনুসরণে আমাদের ব্যাপকসংখ্যক কৃতি ছাত্র–ছাত্রী এবার যে অবস্থাটির সম্মুখীন হতে যাচ্ছেন তাকে এক কথায় হয়তো বলা যায় সাফল্যের বিড়ম্বনা। না, এটা অসংখ্য কৃতি ছাত্র–ছাত্রী কিংবা তাদের অভিভাবকদের নিরুৎসাহিত করার কথা নয়। বাস্তবে তারা আজ সকলেই প্রচণ্ড দুশ্চিন্তার মুখোমুখি।

সকলকে এক বাক্যে স্বীকার করতে হবে দেশের চারটি বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল বের হবার সাথে সাথে সারাদেশ জুড়ে এবার ছাত্র–ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের চোখে–মুখে যে আনন্দের ঢেউ উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল এরূপ অভূতপূর্ব চিত্র দরিদ্রতম ও অশিক্ষার অন্ধকারাচ্ছন্ন এ দেশের পোড়াকপালে মানুষদের অতীতে আর কখনও দেখার সৌভাগ্য হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। সম্ভবতঃ আর কিছুর জন্য না হলে এমন এক অকল্পনীয় দৃশ্য সৃষ্টি করতে পারার জন্য অন্ততঃ আমাদের শিক্ষা বোর্ডকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাতে হয়।

কিন্তু একই সঙ্গে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ব্যাপার এই যে, আমাদের লক্ষ লক্ষ ছাত্র–অভিভাবকের মনে–মুখে উথলে ওঠা অভাবিতপূর্ব আনন্দতরঙ্গ শূন্যে মিলিয়ে যেতেও মাত্র কয়েকদিনের বেশি সময় লাগেনি। যতদূর বোঝা যায়, ইতিমধ্যেই ম্রিয়মান হয়ে এসেছে আমাদের আনন্দিত অনেকগুলো মুখ–মাত্র কয়দিন পর তাদেরকে কি ভাগ্যবরণ করে নিতে হবে সে দুশ্চিন্তায় ও উদ্বিগ্নতায়।

পাসের হারের দিক থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষার ফল নিশ্চয় রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। কতদূর সত্য জানি না তবে লোকমুখে শুনেছি কোন ছাত্র–ছাত্রী ফেল করেছে শুনে কেউ কেউ নাকি তেমন খবর বিশ্বাস করতেই চায়নি— যদিও এটা একটি বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, বিশেষতঃ পশ্চিমা উন্নত সমাজের ধাঁচে ১০০ জনে ১০০ জন পাস করার মত অবস্থা বা পরিবেশ আমাদের সমাজে সহজে আসবে না এবং সম্ভবতঃ আসা যে উচিতও নয় তা এবারের বিড়ম্বনাপূর্ণ অবস্থা দেখে অনেকেই নিশ্চয় আঁচ করতে পারছেন।

হ্যাঁ, এ প্রসঙ্গেই আমাদের বোর্ডগুলোর (শিক্ষা) অদূরদর্শিতার ব্যাপারে একটু কথা বলারও প্রয়োজন বোধ করছি। আমাদের সমাজে যারা অনেক বিষয়কেই খুব গুরুত্ব ও গভীর বিবেচনার সাথে গ্রহণ করেন না তাদেরকে প্রায়ই একটি প্রবাদবাক্য বলতে শোনা যায় যে, 'হাতি কিনলে কাছির (দড়ি) অভাব হয় না।' অর্থাৎ হাতির মত বৃহৎ ও প্রচণ্ড শক্তিধর প্রাণীকে বেঁধে রাখার মজবুত দড়ি যেন যে কোনভাবে জোগাড় হয়ে যাবে। অথচ সকলেই জানেন যে কাজটিও খুব সহজ নয়। কাজেই হাতি পোষার জন্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসের ব্যবস্থা করার আগে হাতি কিনে নিয়ে আসা নিশ্চয় একটি অবিবেচনামূলক কাজ। এ কারণেই সম্ভবতঃ বুদ্ধিমান–বিবেকবান লোক মাত্রই বেশি মাংস কেনার আগে মসলা জোগাড় করে রাখেন। কিন্তু আমাদের শিক্ষা বোর্ড–বোর্ডগুলো করলেন এবার সম্পূর্ণ তার উল্টা কাজটি (প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল এর আগেও এ যাবত তারা যেসব কাজ করে এসেছেন সেগুলো যে অভ্রান্ত তা নয়)। লাখ লাখ ছাত্রকে তারা অদ্ভুত কৃতিত্বের সাথে পাস করিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা যাবে কোথায়, কি করবে, কিংবা দেশে ও সমাজে–এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে সে সব বিষয় নিয়ে একটুও বোধ হয় মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করলেন না।

চরম অপরিনামদর্শিতা আর কাকে বলে? প্রচলিত একটা ব্যবস্থাকে রাতারাতি আমূলভাবে পরিবর্তন করা যে (বিশেষ করে গোটা সমাজ কাঠামোকে পরিবর্তন না করে) কি দুঃসাধ্য কাজ তা এ দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলো এবার কিছু আঁচ করতে পেরেছেন কিনা আমরা জানি না, তবে স্বীকার করুন না করুন মনে হয় তারা ইতিমধ্যেই তা কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কারণ, জানা যায়, নয়া পরীক্ষা পদ্ধতি সবেমাত্র এবার শুরু করার পরপরই তা পুনঃ পরিবর্তনের চিন্তা শুরু করে দিয়েছেন তারা। খবরে প্রকাশ আগামী '৯৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার পদ্ধতি এবারের ('৯২) মত রাখা হলেও '৯৪ সাল থেকে আবার নতুন এক পদ্ধতি চালু করা হবে। প্রস্তাবিত নয়া ঐ পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তৃত কিছু না জানায় সেটাও আর এক বিপর্যয়কর কিছু হবে কিনা এই মুহূর্তে বলা মুশকিল।

কিন্তু আবার এক নয়া ব্যবস্থা চালু করার কথা বলে তারা বর্তমানে প্রবর্তিত ব্যবস্থার ভ্রান্তি স্বীকার করেই নিয়েছেন। মাত্র একবার চালিয়েই যে ব্যবস্থা পরিবর্তনের তৎপরতা শুরু করতে হয় তা কতখানি অচিন্তিতপূর্ব সেটা ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখে না। মানুষ অবশ্যই আশা করবে যে, শিক্ষা বোর্ডগুলো ছাত্র–ছাত্রীদেরকে (নিশ্চয় অভিভাবকদেরও) নিয়ে এমন ভ্রমাত্মক পরীক্ষা–নিরীক্ষা আর চালাবেন না।

আমাদের দেশের চির প্রচলিত প্রথানুযায়ী প্রথম বিভাগে পাস করা ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যাই হয় সর্বাপেক্ষা স্বল্প– আর স্টার পাওয়াদের সংখ্যা তো থাকে প্রায় হাতে গোনা। অথচ বিগত অনেক বছর থেকেই দেখা গেছে সর্বাপেক্ষা কম পাসের হারের বছরেও প্রথম বিভাগে পাস করা ছেলে– মেয়েরা তো বটেই এমন কি কোন কোন স্টার পাওয়া ছাত্র–ছাত্রীরাও আশানুরূপ বিষয়ে এবং কাংখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারেনি। অনেককেই চলে যেতে হয়েছে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের আকাঙ্খা ও রুচি বিরোধী শিক্ষার পথে বা একেবারে ভিন্ন লাইনে অর্থাৎ শিক্ষার পথ ছেড়ে অন্যদিকে। এসব বিষয় শিক্ষা বোর্ডসহ অন্যান্য কোন কর্তৃপক্ষের অজানা নয়। এরপরও তারা কোন আগপর বিবেচনা না করে এমন এক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করে দিলেন যার ফলে মোট পাস করা ছাত্র–ছাত্রীদের প্রায় ৪২/৪৩ শতাংশই পেলেন প্রথম বিভাগ (প্রথম বিভাগ প্রাপ্তদের /মোট সংখ্যা হলো ১ লাখ ৪৬ হাজার ৪৪১ জন যেখানে মোট পাসের সংখ্যা হলোঃ ৩ লাখ ২১ হাজার ৬৭৫ জন— ৪ বোর্ড মিলে)। ৬/৭টা লেটার (বাংলা–ইংরেজীসহ) ও স্টার পাওয়াদের সংখ্যাও এক কথায় অগণির্ত। আমি নিজেও ইতিমধ্যে অনেক স্টার পাওয়া ছাত্র–ছাত্রীর দেখা পেয়েছি যারা নিজেদের আকাংখিতত কলেজে ভর্তি হতে পারবে না আশঙ্কায় রীতিমত আতংকে রয়েছে। এ অবস্থায় সাধারণ প্রথম বিভাগ পাওয়াদের দুশ্চিন্তা সহজেই অনুমান করা যায়। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ পাওয়াদের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে তা আলোচনার প্রয়োজন নেই।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, '৮৮–৮৯ ও '৮৯–৯০ সালে এসএসসি পরীক্ষায় পাসের সংখ্যা ছিল অনেক কম। ৪টি বোর্ড থেকে '৮৮–৮৯ সালে মোট পাস করেছিল ১ লাখ ৮৬ হাজার এবং '৮৯–৯০ সালে মোট পাস করেছিল ১ লাখ ৩৮ হাজার অর্থাৎ ঐ দুই বছরে ৪টি বোর্ড থেকে মোট পাস করেছিল ৩ লাখ ২৪ হাজার ছেলে-মেয়ে। কিন্তু এ বছর একাই পাস করেছে ঐ দু'বছরের মিলিত সংখ্যার সমান। অথচ কথিত ঐ দু'বছরেও উত্তীর্ণ ছাত্র–ছাত্রীদের ভর্তি তথা এসএসসি পরবর্তী পড়াশুনা চালিয়ে যাবার সম্যো মোটেই কম ছিল বলে কেউ দাবী করতে পারবে না। তবে পূর্বোক্ত দু'বছরের থেকে এবার একটি মৌলিক পার্থক্য হলো এই যে, সে দু'বছর মোট উত্তীর্ণ ছাত্র–ছাত্রীর চেয়ে দেশে বিরাজমান উচ্চ–মাধ্যমিক ও ডিগ্রি কলেজগুলোর মোট আসন সংখ্যা বেশি ছিল। ফলে অনেকে আশানুরূপ কলেজে ভর্তি হতে না পারলেও যে কোন কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া একান্ত আগ্রহীদের জন্য অসুবিধা ছিল না। এবার কিন্তু তা–ও সম্ভব হবে না। যত্রতত্র ভর্তি হতে চাইলেও অনেক ছাত্র–ছাত্রী এ বছর তা পারবেন না। মনে হয়, কর্তৃপক্ষ যেন তাদেরকে সাফ সাফ বলে দিচ্ছেন যে, 'না বাপু আর দরকার নেই, তোমরা এখনই পড়ালেখা বন্ধ কর।'

অন্যদিক থেকে ভাবলে মনে হয় গৌণভাবে না বলে কথাটি এখন সরাসরি বলে দেয়াই কর্তৃপক্ষের উচিত। যদি এসএসসি–তে যারা উত্তীর্ণ হয় তারা সবাই ব্যাপকহারে এইচএসসিতে ভর্তি হয়ে যায় এবং যথারীতি পাসও করে (বর্তমানে চালু করা ব্যবস্থায় ধরে নেয়া যায় যে তা করবেই) তখন অনেকেই তো যে যার পথে আরও উচ্চতর লেখাপড়ার দিকে যাবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি (এমএ, এমএসসি, এমকম ইত্যাদি) নিয়ে কিংবা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হয়ে বের হবেন। ইতিমধ্যেই তো এসব উচ্চ ডিগ্রিধারীদের অবস্থা করুণ হয়ে উঠেছে। চাকরির বা কর্মসংস্থানের সুযোগ বলতে কারো নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ডিগ্রিধারীদের তো প্রশ্নই নেই–ডাক্তার–ইঞ্জিনিয়াররাও কেউ চাকরি পাচ্ছেন না।

এমন হতাশাব্যঞ্জক যেখানে অবস্থা সেখানে মানুষকে বিশেষতঃ তরুণ সমাজকে কোন বিভ্রান্তিতে না রেখে হয়তো সরাসরি বলে দেয়াই ভাল যে উচ্চতর পড়ালেখার পথে বেশি এগিয়ে লাভ নেই। তেমন দুঃসাহসিক কথা কেউ নিশ্চয় বলতে চাইবেন না। কিন্তু আরও কিছু সম্পর্কিত বিষয়েও কেউ শান্ত ও গভীরভাবে চিন্তা করছেন কিনা আমরা জানি না। আরো মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করাসহ সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে নতুন নতুন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে বা তা করার ছাড়পত্র দেয়া হচ্ছে। কারো কারো আশঙ্কা প্রাইভেট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে সার্টিফিকেট তথা ডিগ্রি কিনে নেয়ার মতও একটা অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত এত ব্যাপক সংখ্যক যুবক–যুবতীদের কর্মসংস্থানের কি হবে? তা[illegible] তো আর বিদেশে পাড়ি দিতে পারবে না।

বিনোদ দাশগুপ্ত, [illegible]